মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

বেগন স্প্রে, ফিনাইল ও সামান্য কেরোসিন

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের কলেজের এক অপূর্ব সুন্দরী ছিল পরমিন্দর কাউর। পরমিন্দরের বাড়িতে যারা কখনও-সখনও যেতে পারত, তাদের মুখে শুনেছি তার দিদি (যে আমাদের কলেজে পড়ত না) রভিন্দর কাউর আরও সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী রবীন্দ্রনাথ দেখার

কালচারাল শক সহ্য করতে পারব না বলে আমি আর ও রাস্তা মাড়াইনি। তাছাড়া গলিই এত মনোরম ছিল যে রাস্তার কথা সবসময় মনেও আসত না।

তা এই পরমিন্দরকে স্বপ্নে দেখছি (সব স্বপ্নই পরে ভোরে দেখেছি বলে মনে হলেও এটা সত্যি সত্যি ভোরবেলার ঘটনা) -- এমন সময় জ্যোলাপ খাওয়া ঘোড়ার মতো ফোনটা বেজে উঠল। নীল রঙের নাইটি পরা পরমিন্দর আদুরে গালায় তখন আমায় বলছে -- চাউমিন খাওয়াতে নিয়ে যাবে গো ? ভীষণ ইচ্ছে করছে। সস্তার হোটেল হলেও হবে (কেন সস্তার হোটেল ? আমি স্বপ্নেও গরিব নাকি ?)

আমার তো আরও কত কিছু ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ফোন। জড়ানো গলায় বললাম -- হ্যাঁ।

ওপাশ থেকে একটা হেঁড়ে গলায় বলে উঠল -- না (পড়ুন 'কুত্তা')।

এক ঝটকায় আমার ঘুম পরমিন্দর পার হয়ে দিলওয়ালে দুলহানিয়া পার হয়ে, পাঞ্জাবের সর্ষে খেত পার হয়ে একটা গাদাগাদি বাস টার্মিনাসের সামনে এসে দাঁড়াল। রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন বাবু রতন মজুমদার।

-- পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস ! ওদিকে সুজাতার শ্বশুর স্যুইসাইড করেছে, জানিস ?

স্তম্ভিত হয়ে গেলেও সামলে নিলাম। এমন একটা কিছু না ঘটলে এই সাতসকালে রতন আমায় ফোন করবেই বা কেন ? একটু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম -- কখন মারা গেলেন ?

-- আরে মরেনি। মরলে তো ঝামেলা চুকেই যেত। বুড়ো বিচ্ছু ভোরবেলা উঠেই বেগন, ফিনাইল আর কেরোসিন খেয়ে নিয়েছে। রুচিটা ভাব একবার ! বেগন আর ফিনাইল খাবি খা, তা বলে সঙ্গে কেরোসিন ? একটা স্ট্যান্ডার্ড রাখল না মাইরি !

উত্তেজনায় খাড়া হয়ে বসলাম -- কখন ঘটল এতসব ?

-- এই তো দশ মিনিটও হয়নি এখনও। সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে আমায় ফোন করেছিল। আমি ওর ফোন ছেড়েই তোকে ধরলাম। এখন যা করার তোকেই করতে হবে।

আমি ? আমি কী করব ?

-- ওরে আমার ন্যাকাসোনা 'আমি কী করব' ? গায়ে নামাবলী জড়িয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে রাস্তায় বেরোবে। বুড়োকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে। বুড়ো গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। মতলবটা বুঝলি ? বসে বসে মরবে আর আমাদের হাজতে ঢোকাবে। কিন্তু বাবা, রতন মজুমদারকে অত সহজে ফাঁসানো যাবে না। তুই এক্ষুনি যা বাবলু। লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার আগে বুড়োকে যোধপুর পার্কের নার্সিংহোমে ভরে দিয়ে আয়। আমি কথা বলে রাখছি।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অমি নিজের মধ্যে হঠাৎ করে একটা সাহসের চারাগাছ আবিষ্কার করলাম। রতনকে অমান্য করার সাহস -- কেন, আমি এসব করতে যাব কেন ? মজা মারবে তুমি, আর ঝামেলা পোয়াব আমি ? যদি যেতেই হয়, তাহলে তোকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে।

-- বিশ্বাস কর সোনা। আমি একদম ফেঁসে গেছি। সত্যি আমাদের ডিপোয় ইনস্পেকশন। কেস তো গুবলেট জানিসই। আমি এদিকটা সামলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাচ্ছি। তার আগে পর্যন্ত তুমি একটু ম্যানেজ করে দে ভাইটি। সারা জীবন তোর এই ঋণ ...

-- থাক, আর ডায়ালগ দিতে হবে না। আমি যাচ্ছি। সুজাতা বউদিকে বলে রেখেছিস তো ?

-- আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। রতনের গলায় অনেকটা নিশ্চিন্ততা খেলা করে -- আমি আর সুজাতা মিলেই তো তোর নামটা ঠিক করলাম। ও তোকে ভীষণ স্নেহ করে রে।

-- গ্যাস খাওয়াস না রতন। আমি এমনি এমনই যাচ্ছি। শুধু তোর জন্য এইসব কেসে

জড়িয়ে চাকরিটা না যায়, সেটাই চিন্তা।

-- কিচ্ছু হবে না, বস। রেপ কেস, মার্ডার কেস -- সব আমি সামলে দেব। অনেক খুঁটি আমার ধরা আছে। শুধু এ ঝামেলাটা পার করে দে ভাই ... রতন ফোনটা ছেড়ে দিল।

হায় পরমিন্দর ! আজ তো স্বপ্নে তোমার মুখ দেখতে দেখতেই ঘুম ভাঙল। কিন্তু এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার ?

(২)

রতন মজুমদার আমার ছোটবেলার বন্ধু। তবে জীবনের একটা বড় সময় এবং এখনও মাঝে মাঝে সে আমার বন্ধু কম, মনিব বেশি। নইলে দুবার ফেল করার পর রতনের মনে হয়, সে অনেক কিছু জেনে গিয়েছে। এবার 'পৃথিবীর পাঠশালা'য় ইতি টেনে 'পৃথিবীর পথ'-এ তার বেরিয়ে পড়া দরকার। তা বেরিয়েও সে পড়ল, নানা ঘাটের জল খেয়ে এই আকাশের বাজারে কীভাবে কে জানে একটা সরকারি বাস কন্ডাক্টরের চাকরিও জুটিয়ে ফেলল।

কিছুদিন আগে রতনকে খুব ডিপ্রেসড দেখছিল। পাড়ার আড্ডায় সবাই চেপে ধরলেও সে কিছু উত্তর দেয়নি। পরে আমাকে সমস্ত একান্তে বলেছিল -- আমাকে প্রোমোশন দেওয়ার একটা চক্রান্ত হচ্ছে রে।

আমি হাঁ হয়ে বলেছিলাম - সে তো ভাল কথা !

রতন তৎক্ষণাৎ খেঁকিয়ে উঠেছিল -- কীসের ভাল কথা ? জব স্যাটিসফ্যাকশন বলে কিছু থাকবে ? দুটো জ্যাব্দা খাতা সামনে দিয়ে খাঁচায় ভরে দেবে।

প্রচন্ড গরম চলছিল সে সময়টায়। তার মধ্যে কন্ডাক্টরের কাজে ঠিক কী ধরনের জব স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করায় রতন হেসে বলেছিল -- নিদেনপক্ষে

তিরিশটা সুন্দরী মেয়ে দেখি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায়।

বেশিরভাগ দিন সকালে ডিউটি পড়ায় সন্ধ্যায় অবশ্য রতন অনেক কিছুই করত -- তার মধ্যে একটা ছিল ঝন্টুদার ক্যাটারিং-এ ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে যাওয়া।

খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান রতনের। পোলাওয়ে জাফরান ঠিক কতটা দিলে লোকের গা গুলিয়ে উঠবে, খেতে পারবে না, খাওয়ার টেবিলটা ক'ইঞ্চি উঁচু বা নিচু করে দিলে যে চার পিস মাচ খেত সে দু'পিস খাওয়ার পরই কনুইয়ের ব্যথায় 'আর না, আর না!' করতে শুরু করবে -- সমস্তটাই ছকা ছিল রতনের এনসাইক্লোপিডিয়ায়।

একটু অভিজাত বাড়িতে কাজ পড়লে ঝন্টুদা আমায় ডাক দিত। জর্দা ছোপানো দাঁত বের করে বলত -- আমার আবার ইংরিজিটা ঠিক ... ইয়ে ... জানোই তো ... তুমি একটু লোকজনকে গিয়ে হ্যালো-ট্যালো বলবে। তেমন, তেমন লোকদের ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করবে, রান্না-টান্না কেমন হয়েছে -- এই আর কি।

আমি রাজি হয়ে গেছিলাম। কেননা বদলে আমার এক বেলা ভাল খ্যাঁটন হয়ে যেত। একবার, একবারই অবশ্য রতন ঝন্টুদাকে ম্যানেজ করে আমায় শ'দুয়েক টাকা পাইয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া টাকা-পয়সা নিয়ে ঝন্টুদাও উচ্চবাচ্য করেনি। আমিও কিছু বলিনি।

এরকমই একটা বিয়ের ভোজে রতনের সঙ্গে সুজাতা বউদির আলাপ।

কোথা থেকে পমফ্রেট মাছ আনা হয়েছিল, কে জানে। বিকেলের আগেই পচে গন্ধ বেরোতে লাগল। কটক থেকে নতুন আমদানি করা ঠাকুর ত্রিভঙ্গমুরারীর মতো বেঁকে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলতে লাগল -- মু এ মছ ভাত্তি পারিবি নাহি।

মাথায় হাত। এবং হাতে হ্যারিকেন। রুই মাছের কিছুটা সাইড করে কাঁটা ফেলে দিয়ে তার সঙ্গে পচা মাছের কম পচা অংশ পাইল করে আশ্চর্য দক্ষতায় রতন সবটা সামলে নিল। শুধু ফিশ ফ্রাই দেওয়ার ভারটা ও নিজে হাতে রাখল।

ফুলবাবু সেজে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। গুণছিলাম, কতজন করে বসছে। অকারণে হেঁ, হেঁ-ও করছিলাম একটু, আধটু। এমন সময় সুজাতা বওদি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন -- এখানে একটা ফিশফ্রাই দিতে বলবেন।

ট্যান খেয়ে গেলাম। সুজাতা বউদিরা পাড়ায় নতুন এসেছেন। কারও সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় তেমন নেই। তবে ওঁর কাটা-কাটা চোখ-মুখ, পাকা গমের মতো গায়ের রঙ আর জলপ্রপাতের মতো ধারালো একই সঙ্গে উজ্জ্বল ও একটু ভারী ফিগার ছিল আমাদের আড্ডার আলফালফা টনিক।

আমাদের শহরতলি এলাকায় সাজপোশাকের নভেম্বর বিপ্লব বলতে গেলে সুজাতা বউদিই শুরু করেছিলেন। সে রাতে ওঁর পরনে ছিল একটা আকাশিও নীল সিফন শাড়ি। সঙ্গে ম্যাচিং পিঠখোলা স্লিভলেস ব্লাউজ।

কাছে দাঁড়িয়ে আমার পা একটু একটু কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল সমুদ্রের মধ্যে ফসফরাস এই বুঝি জ্বলে উঠবে দপ করে। কিন্তু উনি ফিশ ফ্রাই চাইতেই আমি নীচে গেলাম। ছাদের যেখানটায় রান্না হচ্ছিল সেখানে গিয়ে রতনকে ফিসফিস করে বললাম -- ফিশফ্রাই।

রতন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল -- হবে না ফিশফ্রাই।

আমি প্রায় মিনতি জানানোর ভঙ্গিতে বললাম -- রতন, সেক্সি বউদি চাইছে।

রতন কী বুঝল কে জানে, কাপড়ের ফাঁক দিয়ে যেদিকে খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট সেদিকে তাকাল।

আমি সুজাতা বউদিকে দেখিয়ে আবার বললাম -- আর কাউকে না দিস, সেক্সি বউদিকে অন্তত একটা দিয়ে আয়।

এবার আর দেরি না করে রতন ট্রে হাতে সুজাতা বউদির সামনে চলে গিয়ে তাঁর পাতে ঝপাঝপ দুটো ফিশফ্রাই ফেলে দিল। উনি প্রায় আঁতকে উঠে বললেন -- এ কী ! এ কী ! আমি তো চাইনি !

সঙ্গে সঙ্গে রতন ওখানে দাঁড়িয়েই আমার দিকে ঘুরে বলল -- কী রে বাবলু, তুই যে বললি সেক্সি বউদি ফিশফ্রাই চাইছে ?

অনেক প্রার্থনা সত্ত্বেও আমার পায়ের নীচের মাটি দু'ভাগ হল না। ন যযৌ ন তস্থৌ। আমি ভাবতে লাগলাম, কখন আমার গালে হিলতোলা জুতো এসে পড়বে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের পর সেকেন্ড টিক টিক করে ছুটে যেতে লাগল, কিছুই হল না। শুধু আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, সুজাতা বউদি তাঁর অনাবৃত বাঁ হাত ওপরে তুলে কপালে এসে পড়া চুল পিছনে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন। আর শুনলাম, স্পষ্ট নিজের কানে শুনলাম, রতন জিজ্ঞেস করছে -- আরেকটা ফিশফ্রাই দেব সেক্সি বউদি ?

এরপর নদী আপন বেগে পাগলপাড়া। পাড়ার আড্ডায় রতন নতুন করে হিরো। সবাই একবার করে তাকে সেলাম জানায় আর বলে -- কী জিনিস তুল্লে গুরু ! কিন্তু রতন সুজাতা বউদির সঙ্গে তার প্রেম-ট্রেম বেমালুম অস্বীকার করে বলে, পুরো ব্যাপারটাই নাকি বন্ধুত্ব। আরও বলে -- মানুষ চাঁদে আছে, মঙ্গল গ্রহে আছে। আর এই একবিংশ শতাব্দীতেও একটা ছেলে কোনও বিবাহিত মহিলার বাড়ি গেলেই তা নিয়ে বাওয়াল হবে ?

একবিংশ বলার সময় রতনের গলা খাদে নেমে যায়। আমরা চার্জড হয়ে যাই।

কিন্তু রতনের যাতায়াত শুধু সুজাতা বউদির বাড়িতেই সীমাবদ্ধ রইল না। মাঝেমধ্যে ওদের দুজনকে ভিক্টোরিয়া, বিড়লা তারামন্ডল, সায়েন্স সিটি ... এরকম আরও অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গায় দেখা যেতে লাগল।

সুজাতা বৌদির মেয়ে মুন্নি মাঝেসাঝে ওদের সঙ্গে থাকলেও সবসময় যে থাকত, তা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই থাকত। নইলে তার হাফ

ইয়ারলির রেজাল্ট কেন এত খারাপ হবে (দু'বিষয়ে ফেল) ? আর কেনই বা তার সপ্তাহে একদিন এসে আটশো টাকা পাওয়া মাস্টারের জায়গায় অ্যানুয়ালে আগে ২-৩ মাস কাজ চালিয়ে দেওয়ার জন্য ডাক পড়বে আমারই ? আর আমি রাজিও হয়ে যাব ? মাইনের অঙ্ক খারাপ হবে না -- রতনের এটুকু আশ্বাসেই।

সুজাতা বউদির বাড়ি গিয়ে আমি প্রথম যাকে দেখে চমৎকৃত হই, সেই লোকটি ওঁর বর প্রদীপবাবু। আমি মনে মনে ওঁর নাম দিয়েছিলাম 'মাটির প্রদীপ'।

বিরাট শিক্ষিত মানুষ। বিদেশি ফার্মে বড় চাকরি করেন। কিন্তু সারাদিন বাড়িতে থাকলেও তাঁর গলার আওয়াজ শোনার জো নেই। সবসময় 'দেখিতে না পাও ছায়ার মতো আছি কিনা আছি' ভঙ্গি নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। এবং পরিচিত সকলের জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য একটা অনুতাপ ঝরে ঝরে পড়ে তাঁর মুখ থেকে।

সুজাতা বউদির শ্বশুর মৃত্যুঞ্জয় বসু ঠিক এর উল্টো। মাটির প্রদীপের বাবা হলেও তিনি 'হাজার টাকার ঝাড়বাতি'। পড়াতে আসার দু'দিনের মধ্যেই আমি বুঝে গেলাম, এ বাড়িতে মূল লড়াইটা চলে বিপত্নীক শ্বশুরমশাই এবং তাঁর আলোকপ্রাপ্তা পুত্রবধূর। আর এঁদের মধ্যে লিয়াজঁ অফিসারের কাজ করে মুন্নি।

মুন্নির অ্যানুয়াল পরীক্ষার কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুঞ্জয়বাবু বেশ গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে খাটের উপর বসে পড়লেন। মিনিট পাঁচেক হয়ে গেল, কোনও সাড়াশব্দ নেই দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম -- কিছু বলবেন মেসোমশাই ?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন -- মেসোমশাই, মেসোমশাই কোরো না তো। যাদের জীবনে মাসিমা নেই, তাদের কাছে এই ডাকটা দুর্বিষহ।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম -- ও, স্যরি।

মুন্নি ফোড়ন কেটে বলল -- তাহলে কী বলে ডাকবে ?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু এবার আর রাগলেন না। মিষ্টি হেসে বললেন -- কী আবার ডাকবে -- কাকু, জ্যেঠু -- এসব কিছু। তারপর আমার দিকে একটু চোখ মটকে বললেন -- আমার বউমাকে যা বলে ডাকো সেটা তো আর ডাকতে পারবে না, তাই না ?

আমি বিষম খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম -- আপনি ! আপনি জানলেন কী করে !

-- পিঠে কুলোও বাঁধিনি, কানে তুলোও গুঁজিনি। যা রটে তা শুনতে পাব না কেন ?

আমি আমতা আমতা করে বললাম -- আসলে, ওই নামটা একদমই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ...

মৃত্যুঞ্জয়বাবু হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন -- তোমার কাছে ও ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করতে আমি আসিনি। আমার একটা অন্য জরুরি দরকার আছে।

মাথা নিচু করে বললাম -- কী, বলুন।

মৃত্যুঞ্জবাবু মুন্নির দিকে তাকিয়ে বললেন -- তুমি দশ মিনিট একটু কার্টুন দেখে এসো তো, দিদিভাই।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন -- ওর মা সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে বেরোতে পরে। আর ও দশ মিনিট একটু কার্টুন দেখতে পারবে না ?

মুন্নি আমাকে আলতো মুখ ভেংচে বেরিয়ে গেল। আর উত্তরের অপেক্ষা না করে মৃত্যুঞ্জবাবু সিধে দরকারে ঢুকে পড়লেন -- শোন, আমায় একটা বাচ্চা মেয়ে দিতে পারো -- এই পার্সোনাল কাজটাজের জন্য ?

আমি থতমত খেয়ে বললাম -- বাচ্চা মানে, মুন্নির মতো ?

-- ধ্যাত ! সে তো চাইল্ড লেবার হয়ে যাবে। এই ধরো, সতেরো-আঠারো। পড়াশুনোও করল, আবা দরকার-টরকারগুলোও একটু দেখল। তোমার মাসিমা মারা যাওয়ার পর এই সুজাতার পাল্লায় পড়ে আমার অবস্থা তো বোঝো।

এবার মৃত্যুঞ্জবাবু যেচেই মেসোমশাই হলেন।

কীভাবে 'না' করব ভাবতে ভাবতে বললাম -- আমি একটা স্কুলে মাঝে মাঝে পড়াতে যাই (অবৈতনিক)। সেখানে ১৩-১৪ বছরের মেয়েরা পড়াশুনো করতে আসে। ওদের কাউকে যদি কাছে রাখেন, পড়ান, তাহলে একটা সোস্যাল সার্ভিসও হয়, আবার ...

আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মৃত্যুঞ্জবাবু বললেন -- দ্যাখো, ওসব সোস্যাল সার্ভিসের গপ্পো-টপ্পো আমায় দিও না। অমন অনেক সার্ভিস দিয়েছি সারাজীবন। এখন একটু সার্ভিস পেতে চাই। বাচ্চা মেয়ে হলে হাজারো অসুবিধা। সতেরো-আঠারো বছর হলে একটু ম্যাচিওর হয়।

বুঝলাম, বুড়োকে রসে ধরেছে। জিজ্ঞেস করলাম মাইনে-টাইনে ?

মৃত্যুঞ্জবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন -- এনি অ্যামাউন্ট। আট হাজার টাকা পেনশন পাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কী কাজ করতাম, জানো ?

আমি আর কোনও উত্তর দিলাম না। মুন্নির অ্যানুয়াল পরীক্ষা অব্দি এড়িয়ে এড়িয়ে চললাম। তারপর সুজাতা বউদিকে বলে-কয়ে মানে, মানে টিউশনি ছেড়ে বাঁচলাম।

মৃত্যুঞ্জবাবুকে রসে ধরতে পারে। কিন্তু আমাকে তো ভূতে ধরেনি যে রতনের বান্ধবীর (?) মেয়ের টিউটর আর তার শ্বশুরের সাপ্লায়ার একসঙ্গে হতে যাব। একেবারে একতারাতে দোতারার সুর ? রক্ষা করো, তার ছিঁড়ে যাবে যে।

(৩)

চোখে-মুখে শুধু একটু জলের ঝাপটা দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সুজাতা বউদির বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, মৃত্যুঞ্জয়বাবু সোফার উপর পা তুলে বসে আছেন। আর সুজাতা বউদি নীচে মেঝেয় বসে কাকুতি-মিনতি করছেন।

-- আপনার একটা কিছু হয়ে গেলে আপনার ছেলে আমাকে মেরে ফেলবে।

আমি হাসি চাপতে পারছিলাম না, এই অবস্থাতেও। মেরে ফেলবে কে ? না, মাটির প্রদীপ।

সুজাতা বউদি আমায় দেখে যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন -- এই যে বাবলু, তুমি এসে গেছ ? উফ ! বাঁচালে। এত ভোরে পিসি সরকারও আমার ড্রাইভারকে হাজির করতে পারবে না। তুমি তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডাকো। বাবাকে নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করব কি করব না করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা বাড়ি নেই ?

-- না, ওর দিল্লি গেছে অফিসের কনফারেন্সে। আর এদিকে আমার হয়েছে জ্বালা। আর পারছি না গো ... বলতে বলতে উনি কেঁদে ফেললেন।

আমি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এগোচ্ছিলাম। কিন্তু বেডসিন করে ওঠা নায়িকার মতো এমনই আলুথলু ভঙ্গিমা ওনার তখন যে, সাহস হল না।

মৃত্যুঞ্জবাবু আড়চোখে সব দেখছিলেন। এবার একটু কেশে বলে উঠলেন -- আমি কোথাও যাব না, কোথাও না।

ঠিক তখনই বাইরে একটা ট্যাক্সি থামার আওয়াজ। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল রতন। আমার দিকে একবার আগুনচোখে তাকিয়ে সোজা সোফার সামনে গিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে মৃত্যুঞ্জবাবুকে টেনে তুলল।

মৃত্যুঞ্জবাবু খেপচুরিয়াস হয়ে বললেন -- ইয়ার্কি পেয়েছ বেয়াদব ছোকরা। আমার বাড়িতে এসে আমারই ওপর দাদাগিরি। আমি পুলিশ ডাকব।

রতন সঙ্গে সঙ্গে বাউন্সারটা হুক করল -- পুলিশ কেন, মিলিটারি ডাকুন। আপনাকেও একটু ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিয়ে যাবে। ওই ডবকা মেয়েটার সঙ্গে আরও ভাল করে কাপ-ডিশ ছোড়াছুড়ি খেলতে পারবেন।

কথাটা শুনে মৃত্যুঞ্জবাবু ভাঙলেন, কিন্তু মচকালেন না। ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়লেন -- আশা, আশা !

মুন্নিকে সঙ্গে নিয়ে যে মেয়েটি এবার ঘরে ঢুকল, তাকে আগে কখনও দেখিনি, বয়স আন্দাজ আঠেরো-উনিশ হবে। মুখখানা মিষ্টি, কিন্তু ভোলাপচুয়াস চেহারা ! আর তার সঙ্গে খোলতাই গায়ের রঙ। যেন মে মাসের গরমে রাস্তার ওপর কেউ দু'ড্রাম আলকাতরা ঢেলে দিয়েচে। সুজাতা বউদির সার্থক কনট্রাস্ট। ওকে দিয়ে মৃত্যুঞ্জবাবুর কী আশা যে পূর্ণ হয়, ভগবানই জানেন। নেচে নেচে আয় মা !

আশা কিন্তু এসে দাঁড়াল খুব লাজুক ভঙ্গিতে। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে জিজ্ঞেস করল -- আমায় ডাকছিলেন ?

মৃত্যুঞ্জবাবু গম্ভীর গলায় বললেন -- হ্যাঁ। তারপর একে একে সুজাতা বউদি, রতন আর আমার দিকেও আঙুল তুলে বললেন -- এই সবকটাকে চিনে রাখ। আমার কিছু হলে টিভির লোকেরা ক্যামেরা নিয়ে আসবে। তখন এদের সবাইকে চিনিয়ে দিবি। বলবি, আমার মৃত্যুর জন্য এরাই দায়ী।

সুজাতা বউদি কথাটা শুনে আবার ফোঁপাতে শুরু করলেন। এবং আশাও সেই কান্নায়

যোগ দিল। আমি মনে, মনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে কিন্তু বাইরে একটুও প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করলাম -- আমাকে আবার এসবের মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন ? আমি কী করলাম ?

মৃত্যুঞ্জবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন -- তুমি হচ্ছ এক নম্বরের হাড়ঝিটে বদমাশ ! পড়াশুনো শিখে ওই রতনটার চামচাগিরি করো, লজ্জা করে না ? ভেবেছিলেন, তুমি না দিলে আমি কাজের মেয়ে পাবো না, তাই না ? এই দেখো, দু'চোখ ভরে দেখ ...

বলতে বলতেই তিনি আশাকে হাত ধরে টেনে আনলেন। আশা তার ঝকঝকে দাঁতের পাটি বের করে হাসল। মা কী ছিলেন জানি না, কিন্তু হয়েছেন করালবদনা।

বাইরে ট্যাক্সি হর্ন দিল। মৃত্যুঞ্জবাবু হঠাৎ একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বাথরুমের দিকে ছুটে গেলেন। সুজাতা বউদি সেই দৃশ্য দেখে প্রায় ফেন্ট হয়ে সোফার উপর পড়লেন। রতন সঙ্গে সঙ্গে কাছে গিয়ে ওর ঘাড়ে-পিঠে আলতো চপড় দিতে দিতে বলল -- বি স্টেডি, কিচ্ছু হবে না।

আমি সেই সুযোগে মুন্নিকে একটু সাইডে টেনে ভোরের ঘটনাটা ঠিক কী হয়েছিল জানতে চাইলাম। মুন্নি যা রিপোর্ট দিল, তাং সংক্ষেপে এইরকম :

মুন্নির বাবা সম্প্রতি ফ্রান্স বা ইটালি -- কোনও একটা জায়গা থেকে খুব দামি ক্রকারির সেট নিয়ে এসেছিলেন। ঝামেলা এড়ানোর জন্য উনি স্ত্রী এবং বাবার মধ্যে জিনিসগুলোর একটা সন্তোষজনক বাঁটোয়ারাও করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাতে কেউই সন্তুষ্ট হননি। তাও, দিন একরকম চলে যাচ্ছিল। বিপত্তিটা বাধল আজ ভোরে যখন আশা তাক থেকে কাপ-ডিশগুলো বের করে মাজতে লাগল।

ওই সময়টা মৃত্যুঞ্জবাবু রোজই আশার সঙ্গে কিছু না কিছু খুনসুটি করে থাকেন। কিন্তু আজ তিনি কিছু না বলে-কয়ে একটা ছৌ-নাচের মুখোশ পরে ওকে এন্টারটেইন করতে গেলেন। আশা তাতে আমোদিত হল, না ভয় পেল আশাই জানে। কিন্তু

যতবার 'টুকি' বলে থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিলেন, ততবারই সে ওনার দিকে ওই ইতালীয় বা ফরাসি কাপ একটা করে ছুড়ে দিচ্ছিল।

এরকম দু-তিনটে কাপ খান খান হওয়ার পরে মুন্নির মা অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে আশাকে ঠাস করে একটা চড় মারেন। এবং মৃত্যুঞ্জবাবুকে, সোজা বাংলায়, ধুইয়ে দেন।

রিটার্ন ভলিতে মৃত্যুঞ্জবাবুও রতন এবং অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গ টেনে ছেলের বউকে ল্যাজে-গোবরে করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজ সুজাতা বউদি টপ ফর্মে ছিলেন। সেটা বুঝতে পেরেই হঠাৎ করে রণে ভঙ্গ দিয়ে তিনি ঘরে ঢুকে দরজা দেন। এবং দশ মিনিট পর বেরিয়ে এসে বেগন স্প্রে-র কৌটো এবং ফিনাইল-এর আধখানি বোতল দেখিয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি বেগন, ফিনাইল এবং কেরোসিন খেয়েছেন। ব্যস, একটি ইয়র্কারেই ছেলের বউয়ের মিডল স্টাম্প হাওয়া এবং শ্বশুরমশাই জিন্দাবাদ।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। মৃত্যুঞ্জবাবু ওইসব অমৃত সেবন করেছেন সাড়ে ছটা নাগাদ। মানে, আধঘন্টা সময় অলরেডি চলে গেছে। রতন অধৈর্য হয়ে বাথরুমের দরজা ধাক্কাচ্ছিল, মৃত্যুঞ্জবাবু গম্ভীর মুখে ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন -- ওঘর থেকে আমার পাঞ্জাবি-পাজামাটা নিয়ে এসো তো।

আমি আনতে যাচ্ছিলাম। রতন আমাকে থামিয়ে মৃত্যুঞ্জবাবুকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে বাইরে বেরোতে বেরোতে বলল -- আপনি এই ভাঁজ করা ধুতি পরেই চলুন। ওসব পরে পৌঁছে দেওয়া যাবে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল -- বাবলু, তোকে 'বোকা' বললে অর্ধেকটা বলা হয়। যা ট্যাক্সিটা স্টার্ট করা।

আমি তিনলাফে রাস্তায় নেমে ট্যাক্সির পিছন দরজা খুলে দাঁড়ালাম। মৃত্যুঞ্জবাবুকে হোল্ড অলের মতো ভিতরে ভরে দিয়ে রতন নিজে সামনের সিটে গিয়ে বসল। আমি মৃত্যুঞ্জবাবুর পাশে বসতে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে দেখলাম, সুজাতা বউদি কাঁদো কাঁদো মুখে আমার দিকেই যেন তাকিয়ে আছেন। চোখ দুটো যেন বলছে, তুমিই ভরসা। আমি ওনাকে বলতে গেলাম -- পথে এবার নামো সাথী। কিন্তু ট্যাক্সি স্টার্ট নিয়ে

নেওয়ার 'পথ' আমার গলায় আটকে গেল।

(৪)

-- ভাই, লায়ালকার ভিতর দিয়ে গল্ফ গ্রিন ধরে নেবে। আমি কিন্তু দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। ট্যাক্সিচালককে প্রায় ধমকের সুরে কথাগুলো শুনিয়ে রতন পিছনে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

-- তুই যে বললি, আসতে পারবি না। ম্যানেজ করলি কীভাবে ?

-- আজকে ডিপোর বাইরে বেরনোটা সত্যিই খুব টাফ ছিল। কিন্তু ফোনটা ছেড়েই মনে হল, এ তোর একার কম্মো নয়। তুই পারবি না।

আঁতে ঘা লাগল। বললাম -- পারব না যদি জানিসই, তাহলে আর ফোন-টোন করে সময় নষ্ট করতে গেলি কেন ? ডাইরেক্ট চলে এলেই পারতি।

-- আরে ভাই, নিজে বেরতে পারব, তখন কি জানি ? শেষটায় মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ইনচার্জকে গিয়ে বললাম, বাবার সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। এই নিয়ে সেকেন্ড টাইম। ভোরবেলা বাথরুমে গিয়ে পড়ে গিয়েছে -- এই মাত্র খবর পেলাম। আমাদের ইনচার্জ আবার খুব পিতৃভক্ত লোক। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল।

-- বাড়িতে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিস তো ?

-- বাড়িতে আবার কী বলতে যাব ? রতন একটু অবাক হল।

-- আরে আকাট, তোর বাবা সকালে গড়িয়ায় বাজার করতে যায় না ? হাওয়াই চটি ফটর-ফটর করে এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরবে, ডিপোর কেউ যদি দেখে ফেলে ?

-- দেখলে দেখবে। বলে দেব, বাবার আসলে কিছু হয়নি, হয়েছিল মার। কিন্তু মা

আমার জান-প্রাণ বলে কথাটা সঙ্গে সঙ্গে কেউ আমাকে জানাতে সাহস পায়নি। রতন নির্বিকার মুখে বলল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার একটু আড়মোড়া ভেঙে বললেন -- একটা সিগারেট দাও তো রতন।

-- এখন সিগারেট খাওয়া কি ঠিক হবে আপনার ? রতন সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল -- তুই খাবি একটা ?

আমি ইতস্তত করে বললাম -- না, না মেসোমশায়ের সামনে ...

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন -- খাও তো। যতসব ন্যাকামি ! মুখচোরা গরুই পাল খাওয়ার যম !

-- মানে কী কথাটার ? সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানতে চাইলাম।

-- মানে আবার কী ? যে গরুগুলো বেশি শান্ত, বাচ্চা-টাচ্চা হওয়ার সময় দেখা যায়, সেগুলোই সবার আগে।

-- গরুর ব্যাপারে বাবলুকে ঘাঁটাবেন না। রতন হেসে বলল, ছোটবেলায় ও গরুর লেজ ধরে রাস্তায় ছুটত।

-- আসলে তখনও আমার আগের জন্মের স্মৃতি পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। তাই পুরোনো আত্মীয়-স্বজন দেখলেই ছুটে যেতাম। বড় একটা ধোঁয়া ছেড়ে বললাম।

গল্ফ গ্রিনে ঢোকার মুখে রাস্তায় বড় একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে রতন বলল -- বাড়িটা প্রোমোটারির জন্য নিচ্ছি, বুঝলি।

-- তুই ? প্রোমোটিং করছিস ?

-- আমি মানে, আমরা চার-পাঁচজন। শঙ্করদা, মন্টু -- ওরাই আসল। আমিও আছি। ভদ্রলোক ঢোলাওয়ালা না নোলাওয়ালা -- কাকে একটা দিতে যাচ্ছিলেন। আমি গিয়ে বললাম -- বাঙালি ছেলেদের একটা সুযোগ দিন। ইনস্পায়ার্ড হয়ে গেল। অবশ্য ঢোলাওয়ালাকে সরাতে অন্য কলকাঠিও নাড়তে হয়েছিল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটু বমি করলেন। আমি নার্ভাস হয়ে ওনার হাতটা চেপে ধরলাম। রতন জিজ্ঞেস করল -- অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে ? কুছ পরোয়া নহি। আর ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিট।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটু গা ঝাড়া দিয়ে বললেন -- না, না ঠিকই আছে। আয়াম ওকে।

-- কেন যে বুড়ো বয়সে এসব লাফড়া করতে যান ! রতনের গলায় এবার সত্যিই সিমপ্যাথি -- ভারত-পাকিস্তান শান্তিতে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে, আর আপনারা পারেন না ?

-- বাদ দাও তো ওসব শান্তি-ফান্তি। দু'দিন বাস চলবে, চারদিন ক্রিকেট ম্যাচ হবে, সাতদিনের দিন আবার বম্ব ব্লাস্ট, জঙ্গি অনুপ্রবেশ, কার্গিল ! প্রপার যুদ্ধ ছাড়া জীবনে কখনও শান্তি হয় ?

বুড়ো এবার মনে হচ্ছে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। বলে কী ! একটু কড়া গলাতেই বললাম -- এটা কী বলছেন ? দু-দুটো নিউক্লিয়ার পাওয়ার যুদ্ধ করবে ?

-- ছাড়ো তো তোমার নিউক্লিয়ার পাওয়ার ! মৃত্যুঞ্জয়বাবুর গলা সপ্তমে চড়ল -- আরে বাবা, অ্যাটম বোমা যদি থাকে তো দেখা ! এরাও দেখাক, ওরাও দেখাক, পুজোয় নতুন জামা কিনেছিস তো পড়। সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল, নবমি-দশমী গেল, আর কবে পড়বি ? না, বলে লক্ষ্মীপুজোয় পড়ব। লক্ষ্মীপুজোয় বলছে কালীপুজোয়, কালীপুজোর রাতে বলছে ক্রিসমাসে পড়ব। ও তোমার ক্রিসমাস, ঈদ, বুদ্ধ পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা সব চলে যাবে, নতুন জামা আর পরা হবে না। আমার সাফ কথা, দিচ্ছি, দিচ্ছি করবি না। যদি থাকে তো ঝেড়ে দে ! তোদের পাঁচ কোটি হালকা

হোক, আমাদেরও পাঁচ কোটি হালকা হোক ... একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচি।

রতন সাবাশ জানানোর ভঙ্গিতে হাসল -- এই কথাটা বেড়ে বলেছেন, যুদ্ধ ছাড়া শান্তি হয় না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু সমর্থন আদায়ের ভঙ্গিতে বললেন -- তুমিই বলো রতন, প্রতিটা মুহূর্তে বাঁচার জন্য মারতে হয় না ? এই যে তোমরা প্রোমোটারি করছ, ওই ঢোলাওয়ালাকে ল্যাং মেরে সরিয়ে তবেই তো করছ। এখন তুমিই যদি শান্তিপূর্ণভাবে প্রোমোটিং করতে যেতে, পারতে ? হ্যাঁ, আমি ফোড়ন কাটলাম, হ্যাঁ পারত। তবে সে অন্যরকম প্রোমোটারি।

-- কীরকম ? রতনের গলায় কৌতূহল। সাহস বেড়ে গিয়েছিল। আমি মুচকি হাসলাম। -- সুজাতা বউদি যে ব্লাউজগুলো পড়ে তাতে গোটা পিঠটা এক্কেবারে ময়দানের মতো উন্মুক্ত। ওখানে চাইলে রতন বড় মাল্টিস্টোরেডও তুলতে পারে। কোনও ঝামেলা হবে না। অবশ্য যদি -- আপনার ছেলে বাধা না দেয়।

-- আমার ছেলে ? মৃত্যুঞ্জয়বাবু এই প্রথম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন -- সে তো এক নম্বরের ভেড়ুয়া। মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল বলে তার কোনও গর্ব নেই, এত বড় চাকরি করে বলে তার কোনও দেমাক নেই। তার অহংকার হচ্ছে তার বউ লিবারেটেড। তা 'লিবারেটেড' মানে কী ? না, সন্ধেবেলা কন্ডাক্টরের সঙ্গে বেড়াতে বেরবে।

রতন মারমুখী হয়ে বলল -- অ্যাই, প্রফেশন তুলে খোঁটা দেবেন না, মাইরি।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু কোনও পাত্তা না দিয়ে বললেন -- আর একটা ছেলে বা মেয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যেত, বুঝলে ? তা না, ওই সবেধন নীলমনি একটা মেয়ে ...

-- হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই করেই তো আপনারা যুগে, যুগে মেয়েদের পায়ে শেকল পরিয়েছেন। রতনের গলা উত্তেজিত শোনাল।

-- ওরে আমার সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায় রে ! যাও না ক্ষেতমজুর, বিড়িশ্রমিক, রিকশাওয়ালা, ছাতাওয়ালার ঘরে ঘরে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করো। তাহলে তো ওই উদয়াস্ত খেটে যাওয়া মেয়েগুলো প্রাণে বাঁচে। সব ক্যাদ্দানি কেবল মাসে তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করা লোকগুলোর কাছে ! আরে, এইসব বাড়িতে একটাই বাচ্চা থাকলে না চাইতেই সব পেতে পেতে সে কীরকম স্বার্থপর হয়ে উঠবে, বোঝ ?

-- মুন্নি ওরকম হবে না। ও তো এখন থেকেই খেটে খাওয়া আমার কম্পানি পাচ্ছে। রতন একদম বেল্টের নীচে মারল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু কোনও জবাব না দিয়ে আবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বমি করতে গেলেন আর ট্যাক্সিটা তখনই ঘ্যাঁচ করে নার্সিংহোমের সামনে এসে দাঁড়াল।

রতন নামতে নামতে বলল -- তুই ওনাকে নিয়ে একটু রিসেপশনে বস, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

রিসেপশনে একটাই খালি চেয়ার ছিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে বসিয়ে আমি পাশে দাঁড়ালাম। তারপর নিজের অজান্তেই ওঁর হাত দুটো চেপে ধরে বললাম -- মেসোমশাই, আপনাকে কিন্তু ফিরে আসতেই হবে। গলাটা নিজের কানেই কেমন যেন শোনাল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার দিকে ভাল করে তাকালেন। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললেন -- ফিরব না কেন ? তুমি কি বিশ্বাস করো নাকি আমি ওইসব বেগন স্প্রে, ফিনাইল-টিনাইল খেয়েছি ?

হতভম্ব হয়ে বললাম -- মানে ?

-- মানে, দু ঢোক কেরোসিন খেয়েই মনে হল, নকলটাকেই যদি আসল বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কেমন হয় ? মৃত্যুঞ্জয়বাবু আবার মুচকি হাসলেন। তারপর গলা আরও নামিয়ে বললেন -- তবে এসব কথা রতনকে জানিও না যেন, কেমন ? ওকে

একটু অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া দরকার।

-- কিন্তু ডাক্তাররা বুঝে ফেলবে না ?

-- ফেললেই বা কী ? এখানকার আর এম ও আমার ছোট ভাইয়ের ক্লাসমেট। নইলে রতনের কথামতো থোড়াই এখানে আসতাম।

রতনকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে মৃত্যুঞ্জয়বাবু চুপ করে গেলেন।

আমি আর কোনও কথা বলতে পারলাম না। দু'পা এগিয়ে এসে মৃত্যুঞ্জয়বাবু সুজাতা বউদি আর রতনের মাথার ওপর দিয়ে যে বলটা তুলে দিলেন, সেটা মাঠ পেরিয়ে, গ্যালারি পেরিয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে, তাই শুধু ভাবতে পারলাম।

(৫)

আজ সুজাতা বউদি বাড়িতে আমার আর রতনের নেমন্তন্ন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন -- সেই আনন্দে। মাটির প্রদীপ খুব ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। আর মাঝেমধ্যেই আমার হাতটা ধরে বলছে -- সত্যি, তোমরা না থাকলে সেদিন যে কী হত !

রতনের আজ থেকে ডিউটি। তাই সে আর মৃত্যুঞ্জয়বাবু আগেভাগেই খাবার টেবিলে বসে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গত করছে মুন্নি। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর যদিও এখন রেসট্রিকশন চলছে, তবু তিনি আজ চিংড়িমাছের মালাইকারি থেকে সর্ষে ইলিশ -- সবই একটু চেখে-চেখে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করছেন। খুবই স্বাভাবিক, তাঁর সেই ইচ্ছায় বাদ সাধেনি কেউই। পরিবেশন করছেন সুজাতা বউদি। ঘিয়া রঙের গরদের শাড়ি ও লম্বা হাতাওয়ালা ব্লাউজে ওঁকে আজ সত্যিই অন্যরকম অপূর্ব দেখাচ্ছে। ডুরে শাড়ি পরা আশা সব এগিয়ে-পিছিয়ে দিচ্ছে। দুশ্চিন্তায় একটু রোগা হয়েছে বলেই বোধহয় ওকেও মন্দ দেখাচ্ছে না।

বেশ বড় একজোড়া ইলিশ মাছের ডিম পাতের ওপর পড়তেই রতন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল -- এই সময় এত বড় ইলিশের ডিম ? বাবা, ভাল ফাউ তো !

সুজাতা বউদি কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলে উঠলেন -- এই ফাউ জিনিসটা কিন্তু খতরনাক, রতন।

রতন ডিমে একটা কামড় দিয়ে জিজ্ঞেস করল -- কেন ? এখন তো একটা কিনলে একটা ফ্রি-রই যুগ।

-- ওইখানেই তো মুশকিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন -- এরপর কোনওদিন দেখবে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, 'জামাই কিনলে লাঠি ফ্রি।' তার মানে কী ? না, জামাই খোঁড়া !

রতন হো হো করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে সুজাতা বউদিও যোগ দিলেন এবং আশাও।

'ঘরের মধ্যে ঘর' গড়ে ওঠার আগেই ধূলিসাৎ। বৃহত্তর বসু পরিবার আবার একই আকাশের নীচে মজবুত ও তন্দুরস্ত।

আমি গ্যারেজের সামনে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। হঠাৎ কাঁধের উপর একটা হাতের ছোঁয়ায় ঘুরে দেখি মাটির প্রদীপ। হাসিতে মুখ ভরা -- কী হল ভাই, বাইরে কেন ? ভিতরে চলো।

আমার একটিবারের জন্যও ওর গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হল না। বললাম -- এই তো এক্ষুনি যাচ্ছি। মনে মনে বললাম, বেগন স্প্রে আর ফিনাইল এখনও এ ওর টক্কর নিচ্ছে, যেমন টক্কর নেয় মাতাদোর আর ক্ষ্যাপা ষাঁড়, কিংবা ডুবোপাহাড় আর সাবমেরিন। এসবের মধ্যে সবসময় মাটির প্রদীপ কিংবা কেরোসিন শিখার মতো দুধভাতের থাকা উচিত নয়। সুজাতা বউদি থাকুন, আশাও থাক। আমরা তো সবাই

জানি সেই সিনেমাটার নাম -- 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড ওম্যান' যার পোস্টারের নীচে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'।

||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত||ই-বুক||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com